প্রথম অধ্যায়

ঠাকুরবাড়ির সাংগীতিক পরিবেশ ও শিশু রবির জীবনে তার প্রভাব

প্রথম অধ্যায়

ঠাকুরবাড়ির সাংগীতিক পরিবেশ ও শিশু রবির জীবনে তার প্রভাব

।। এক ।।

উনিশ শতকে সংগীতের পীঠস্থান কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ফলে শিশু বয়স থেকেই সংগীত ছিল তাঁর রক্তে এবং খুব সহজেই তিনি সংগীত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সাঙ্গীতিক পরিবেশের প্রাণপুরুষ ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রভাবে যে ধরনের সাঙ্গীতিক চিন্তা-চর্চা ছিল, তাতে লাভ হল বাড়ির ছেলেদের ছেলেদের ভিতর সঙ্গীতের সুর, স্বর, ধ্বণি ও বানী যেন স্বতন্ত্র মাত্রা যোজনা করেছিল।

শুধুমাত্র আভিজাত রক্ষার প্রয়োজনেই যে ঠাকুরবাড়িতে সংগীতচর্চা ছিল, তা নয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। যদিও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চা সেকালের অভিজাত পরিবারের আভিজাত্যের প্রধান অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হত। কাজেই ঠাকুর পরিবারেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। শাস্ত্রীয় সংগীত ছাড়াও তারা ফরাসী ও ইউরোপীয় অর্থাৎ প্রাচ্যও পাশ্চাত্য দুই প্রকার সংগীতেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সংগীতের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠার জন্যই ঠাকুর পরিবারের নারী-পুরুষ সকলেই ছিলেন সংগীতানুরাগী।

তখনকার সেই স্বদেশী যুগে আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেশ জাঁকজমক সহকারে সঙ্গীতের চর্চা হতো। প্রিন্স দ্বারকানাথের কাছে সঙ্গীত কোন সৌখিন ব্যাপার বলে গণ্য হতো না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষ ভক্ত। তাই তিনি সঙ্গীত চর্চাকে

বিলাসের অঙ্গ হিসেবে মনে করতেন না। সঙ্গীত ছিল তাঁর কাছে নির্মল আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আর সঙ্গীতের এই অনাবিল আনন্দকে উপলব্ধি করে ভারতীয় সঙ্গীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা ঠাকুরবাড়িতে নিত্যকর্মের মতো ছিল।

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর গানের যোগ্য পরিবেশ পেয়েছিলেন আপন বাড়িতে, একথা কারোর অজানা নয়। তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের আসন বসত, এ বিষয়ে মহর্ষির উৎসাহ ছিল অপরিসীম তাঁর আমন্ত্রণে ভারতের বিভিন্ন স্থানের গুণী শিল্পীদের সমাবেশ ঘটত জোড়াসাঁকোতে। সুতরাং সেইসব আসরে সঙ্গীত শোনার যথেষ্ট সুযোগ ঘটত শিশু রবির। তাছাড়া বাড়ীর ছেলেমেয়েদের অন্তর যাতে বিশুদ্ধ সঙ্গীত রসে উদ্বুদ্ধ হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি নামকরা ওস্তাদদের নিযুক্ত করেছিলেন গৃহশিক্ষক হিসেবেও।

শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ এমন একটা সাঙ্গীতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠায় অতি স্বাভাবিক কারণে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও পৃষ্ঠাপোষকতায় কবির জীবনের প্রথম অবস্থাতেই ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি পরিস্কার ধারণা ও প্রত্যয় মনে বাসা বাঁধে। ছোটবেলা থেকেই সাঙ্গীতিক পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছিলেন বলে প্রাতিষ্ঠানিক সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ না করেও সঙ্গীত বিষয়ে তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু কোনদিনও তিনি নিয়মমাফিক বা ধরা বাঁধা কায়দায় সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন অসামান্য প্রতিভাবান ফলে উচ্চাঙ্গ সংগীতের সেই ভাব, রস ও গাম্ভীর্যবোধে গান রচনা করতে পেরেছিলেন। তাঁর ধরা বাঁধা নিয়মে শিক্ষা গ্রহণ যে একবারেই ভাল লাগত না, সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন ''ছেলেবেলা'' গ্রন্থে —

> ''আমার দোষ হচ্ছে শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশি দিন চালাতে পারে নি। ইচ্ছেমত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভর্তি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তা হলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না। কেননা, সুযোগ ছিল বিস্তর। ... কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অতি — গজগামিনীরে', আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি ...।''[১]

।। দুই।।

যে কোন প্রকার উৎসবেই ঠাকুর পরিবারে সঙ্গীতের আয়োজন হত এবং দেশের বহু স্থানের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গুণী শিল্পীরা ঠাকুর বাড়িতে এসে সঙ্গীত পরিবেশের করতেন। এই রকম পরিবেশে থাকার জন্য ঠাকুর পরিবারের প্রতিটি লোকই সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং ইচ্ছা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায় সকলেই সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী এবং তিনি ভাল পিয়ানোও বাজাতেন। তাঁর ইচ্ছা এবং অনুপ্রেরণাতেই বাড়ির ছেলেরা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুকরণে বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এই সব ব্রহ্মসঙ্গীতে ছিল বেশীর ভাগই ধ্রুপদাঙ্গের। ঠাকুর বাড়িতে সেই সময় ছিল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ব্যাপক চর্চা। ফলে সেই সময়কার বহু বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীরা যারা ঠাকুর বাড়িতে সমাদৃত হতেন তাঁরা হলেন, সে যুগের বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, যদুভট্ট, শ্যামসুন্দর মিশ্র, রাধিকা গোস্বামী প্রমুখ।

হিন্দী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুকরণে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পিতা দ্বারকানাথের ইউরোপীয় সঙ্গীতপ্রীতি পরবর্তীকালে মহর্ষির মধ্যেও প্রভাবিত হয়েছিল, তাই মহর্ষি নিজেও ইউরোপীয় সঙ্গীতের চর্চা করেছিলেন। যে পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় হয়েছিলেন সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত ধারা পৃথকভাবে হয়েও একই সাথে মিশে তৈরী করেছিল ঠাকুর বাড়ির সাঙ্গীতিক পরিবেশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইরা দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সৌমেন্দ্রনাথ প্রত্যেকে সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। এরাও বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত ছাড়াও স্বদেশী মেলার জন্য জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গান ছাড়াও ভাল সেতার বাজাতে পারতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্বরলিপি পদ্ধতির অল্প পরিবর্তন করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্তমান আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

তখনকার যুগে, মেয়েদের গান-বাজনা করার প্রচলন ছিল না। কিন্তু উদারচেতা দেবেন্দ্রনাথ ছেলেদের গান শেখাবার সাথে সাথে মেয়েদেরও গান শেখাবার সুযোগ দিয়েছিলেন। সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেয়েদের গান গাওয়ার ব্যাপারেও মহর্ষির উৎসাহ ছিল উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলাদেবী, সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরা দেবী, হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবী এবং পৌত্রী বাণী দেবীর নাম বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। হেমেন্দ্রনাথ মার্গ সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকেও সঙ্গীত শিক্ষায় বিশেষভাবে উৎসাহ দিতেন। হেমেন্দ্রনাথের স্ত্রী নীপময়ী দেবী তবলা বাদনে বিশেষভাবে পারদর্শি ছিলেন। এছাড়া বাড়িতে ছেলেমেয়েদের জন্য বিলাতী বাদ্যযন্ত্র বেহালা, পিয়ানো ও অর্গান শেখাবার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেই বিশেষভাবে দু'জন সংগীত শিল্পীর দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আপন সংগীত সাধনায়। তাঁদের একজনের নাম বিষ্ণু চক্রবর্তী ও অপরজন শ্রীকণ্ঠ সিংহ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীয়া ছিলেন বিষ্ণু চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীত-গুরু। বিষ্ণু চক্রবতী উত্তর-ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির ধ্রুবপদ, খেয়াল টপ্পা প্রভৃতি গীতরীতি ছাড়াও বাঙালির নিজস্ব গান বাংলা-টপ্পা, টপ্ খেয়াল, শ্যামাসঙ্গীত ও অন্যান্য গান জানতেন ও গাইতেন। তাঁর গানের মধ্যে তানের বাহুল্য ছিল না, ছিল কণ্ঠসৌকর্য এবং প্রাণের ও ভাবের আবেদন। হয়তো বা তাঁর গান-পরিবেশন ও প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতা ও সহজ সুন্দর শৈলীই রবীন্দ্রনাথের মনকে করেছিল প্রভাবিত ও আকৃষ্ট।

বিষ্ণু চক্রবর্তীর সঙ্গীত শিক্ষা ছিল অদ্ভুত ধরণের, সহজ সরল বাংলা গ্রাম্য ভাষার গানের মাধ্যমে তিনি সকলকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকেই আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়কের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই থেকে দীর্ঘ বছর তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করে রাখেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী নিজে ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। আদি ব্রাহ্মসমাজের গানে তিনি ধ্রুপদের ঢঙে সুর দিয়ে নিজে গাইতেন এবং ঠাকুর বাড়ির সকলকে এইভাবে গাইবারই শিক্ষা দিতেন। ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া ছাড়াও কিছুদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়মমাফিক সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই 'ছেলেবেলা'য় লিখেছেন —

> ''এ দিকে বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভর্তি হতে হল। ... যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা, ততদিন বিষ্ণুর কাছে আন্‌মনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছি।''[২]

এই প্রসঙ্গে কবি আরও বলেছেন,

> ''প্রত্যহ শুনেছি সকাল-সন্ধ্যায় উৎসবে-আমোদে উপাসনামন্দিরে তাঁর গান। ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা থেকেও তাঁরা আপন মনে যেসব গান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তার রূপ ও তার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।''[৩]

শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। আর এই সুকণ্ঠের জন্য তাঁর আদর ছিল সর্বত্র। তাঁর এই শিশুকালের গানের প্রধান সমঝদার ছিলেন শ্রীকণ্ঠ সিংহ। শ্রীকণ্ঠ সিংহ বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে। তিনি ছিলেন মহর্ষির বন্ধু ও ভক্ত। সহজ, সরল এবং সদাহাস্যময় স্বভাবের জন্য তিনি শুধু মহর্ষির নন, বাড়ির ছেলেদেরও বন্ধু ছিলেন। তিনি ছিলেন সঙ্গীত পাগল। হাতে সেতার নিয়ে নিজেই বাজিয়ে গান গাইতেন। প্রায় সারাদিনই তিনি সঙ্গীতে তন্ময় হয়ে থাকতেন। তাঁর কথা রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন,

> ''এই সময়ে একটি শ্রোতা লাভ করিয়াছিলাম — এমন শ্রোতা আর পাইব না। ... তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।''[৪]

শ্রীকণ্ঠ ছিলেন বিশ্ববন্ধু, আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেই ছিল তাঁর সমবয়সী, — অন্তরঙ্গ আত্মীয় সদৃশ। কবি নিজেই বলেছেন —

> ''পরিচয় থাক্ আর নাই থাক্ স্বাভাবিক হৃদ্যতার জোরে মানুষমাত্রেরই প্রতি তাঁহার এমন একটি অবাধ অধিকার ছিল যে, কেহই সেটি অস্বীকার করিতে পারিত না। ... এই বৃদ্ধটি যেমন আমার পিতার, তেমনি

দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। আমাদের সকলেরই সঙ্গে তাঁহার বয়স মিলিত। কবিতা শোনাইবার এমন অনুকূল শ্রোতা সহজে মেলে না। ঝরণার ধারা যেমন এক টুকরো নুড়ি পাইলেও তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিয়া মাত করিয়া দেয়, তিনিও তেমনি যে - কোনো একটা উপলক্ষ পাইলেই আপন উল্লাসে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতেন।"[৫]

সঙ্গীত শিক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র। "ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী" — এই গানটি তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে সকলকে শোনাতেন এবং নিজেই সেতার বাজাতেন। '**জীবন স্মৃতি**' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধচিত্তে লিখেছেন,

"গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয়শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান ছিল — 'ময়্ ছোড়োঁ ব্রজ কি বাসরী।' ওই গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক 'ময়্ ছোড়োঁ', সেইখানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালো-লাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।"[৬]

শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ছেলেবেলা'য় বলেছেন —

"আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠ বাবু দিন রাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন; হাতে থাকত গুড়্‌গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে; গুণ্ গুণ্ গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চার দিকে। তিনি তো গান শেখাতেন না; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফূর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে

বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল্ জ্বল্ করত, গান ধরতেন —

'ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী।' সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।"[৭]

'জীবনস্মৃতি'-র এক স্থানে তিনি আবার অনুরূপভাবে বলেছেন — শ্রীকণ্ঠবাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভক্তবন্ধু ছিলেন। 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে — ভুলো না রে তাঁয়' এই ব্রহ্মসঙ্গীতটি তিনি একটি হিন্দি গান থেকে ভেঙে রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"ইনি আমার পিতার ভক্ত বন্ধু ছিলেন। ইঁহারই দেওয়া হিন্দিগান হইতে ভাঙা একটি ব্রহ্মসংগীত আছে — 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে — ভুলো না রে তাঁয়।' এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝংকার দিয়া একবার বলিতেন, 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে' — আবার পালটাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন, 'অন্তরতম অন্তরতম তুমি যে'।"[৮]

এই কথাগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথ শ্রীকণ্ঠ সিংহ সম্বন্ধে কতটুকু শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গীত প্রেম ছিল অবর্ণনীয়। বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুসজ্জাতেও তিনি 'কী মধুর তব করুণা প্রভো' গানটি গেয়ে চির নীরবতা লাভ করে ছিলেন।

আর একটু বড় বয়সে যদুভট্টের কাছে রবীন্দ্রনাথ যে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেন, তার প্রভাবই জীবনে স্থায়ী হয়। এই বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর রবীন্দ্র জীবনী প্রথম খণ্ড পড়লে জানা যায় — যদুভট্ট বা যদুনাথ ভট্টাচার্যকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আহ্বান করে এনে প্রথম বার তাঁর গান শোনেন। তার কয়েক বৎসর পর যদুভট্ট এই ঠাকুর বাড়িতে গানের জন্য নিযুক্ত হন গৃহশিক্ষক হিসেবে। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে এই ঠাকুর বাড়িতেই। এই সময় তিনি কয়েকটি ব্রহ্ম সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন।

যদুভট্ট সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। শুধু একজন গায়ক বলেই তিনি যদুভট্ট সম্বন্ধে শেষ করতে পারেন নি। যদুভট্ট ছিলেন একজন ওস্তাদ জাতের লোক। তাঁর রচিত গানে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে নেই। তিনি ওস্তাদ জাতের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন। তাঁর ছিল প্রতিভা অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। কবি তাঁর ছেলেবেলায় বলেছেন —

> ''তার পরে যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন যদুভট্ট''।[৯]

যদুভট্ট প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ওস্তাদী রীতিতে গান শেখাতে চেয়েছিলেন। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, —

> ''একটা মস্ত ভুল করলেন — জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই। সেইজন্যে গান শেখাই হল না।''[১০]

> যদুভটের কাছে নিয়মমাফিক গান না শিখলেও গুরুদেবের সঙ্গীত জীবনে তাঁর অবদান রয়েছে প্রচুর। আর তাই কবি বলেছেন —
>
> ''কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে — চুরিয়ে। ভালো লাগল কাফি সুরে 'রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া'; রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে।''[১১]

যদুভট্টের রচিত হিন্দী গানের অনুকরণে তিনি বহু গান রচনা করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র সুগায়কই ছিলেন না, ভাল গীতিকার ও সুরকারও ছিলেন। তদানীন্তনকালে ভারতবিখ্যাত যদুভট্টের গান বাল্যকালে বহুবারই গুরুদেব শুনেছিলেন এবং সেই প্রসন্ন - গম্ভীর ধ্রুবপদ ও ভজন গান তাঁর হৃদয়ে যে গভীর রেখাপাত করেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি যদুভট্টের গানকে ওরিজিনাল বা স্বকীয়তা সম্পন্ন বলে উচ্চ-প্রশংসা করেছেন। তিনি যদুভট্টের প্রসঙ্গে বলেছেন, —

> ''ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর

অন্তরের সিংহাসনে রাজ মর্যদায় ছিল। ... তিনি বিখ্যাত যদুভট্ট ... আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন, নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে, বাংলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায় নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটা Originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।"[১২]

।। তিন ।।

যে কোন উৎসবেই নামী শিল্পীরা ছাড়াও ছেলেমেয়েরা মিলে সঙ্গীতের আসর বসাত। যেমন — মাঘোৎসব, বর্ষামঙ্গল, ১লা বৈশাখ ইত্যাদি এই সমস্ত উৎসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু গান রচনা করে তাতে সুর দিয়েছেন। ঠাকুর বাড়ির এই রকম সাঙ্গীতিক পরিবেশের জন্য মেয়েরাও সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শিশুবয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন খামখেয়ালী স্বভাবের এবং ধরাবাঁধা চিরাচরিত প্রথার একেবারেই বিরুদ্ধে। সঙ্গীত শিক্ষার ব্যাপারেও এর ব্যতিক্রম হল না। তিনি গান শিখেছিলেন লুকিয়ে লুকিয়ে, কখনও বাড়ির আর অন্যান্য ভাইদের মুখে শুনে। এই বিশাল সাঙ্গীতিক পরিবেশের অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, সহযোগিতা সমস্ত কিছুই পেয়েছিলেন জোড়সাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের কাছ থেকে, বিশেষত পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে।

পিতার পরই দাদারা তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী। বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের প্রায় সকলেরই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বিশেষ দক্ষতা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। গান ছাড়াও যন্ত্র সঙ্গীতে তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। তিনি ভাল বাঁশী ও অর্গান বাজাতেন। কাব্য ও দর্শন দুদিকেই তার ছিল অসাধারণ প্রতিভা। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাংলা ব্রহ্মসঙ্গীত ও স্বদেশী মেলার জন্য জাতীয় সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভগ্নিপতি সারদাপ্রসন্ন গাঙ্গুলী ছিলেন একজন দক্ষ সেতারী।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সে ঠাকুর বাড়িতে সংগীত কাব্য—সাহিত্যের আলোচনার একটা স্রোত বয়ে চলেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যরচনায় মগ্ন। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে লিখলেন —

''বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্নপ্রয়াশের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়ছিড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই।''[১৩]

তিনি আবার অন্যত্র লিখেছেন —

> ''আমি ঘরের একটি কোণে বসিয়া বা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা (স্বপ্নপ্রয়াণ) শুনিবার চেষ্টা করিতাম। ... শুনিয়া তাহার বহুতর স্থান আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।''[১৪]

সাহিত্যের রসগ্রাহিতা যেমন ঠাকুর পরিবারের ছেলেমেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, গীতকুশলতা ছিল তেমনি তাঁদের প্রকৃতিগত। এই ঠাকুরবাড়িতে শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, আরও অসংখ্য প্রতিভা ধরেন জন্মও হয়েছিল। সৃজনশীলতায় তাঁরা প্রত্যেকেই অনন্য। কিন্তু একা রবীন্দ্রনাথ এমন এক বহুধাবিস্তৃত মনন ও মেধার অধিকারী যে, অন্যদের সৃজন প্রক্রিয়া আমাদের কাছে যেন ম্লান হয়ে যায়, একা রবীন্দ্র আলোয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতজীবনে দাদাদের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, সৌমেন্দ্রনাথ এবং বিশেষতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষভাবে পড়েছিল। তিনি নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অঙ্কুরিত প্রতিভাকে ভাবীকালে সফল করে তুলতে সাহায্য করেছেন। এই সঙ্গীত সেবী জ্যোতিদাদার কাছেই রবীন্দ্রনাথ গীত-রচনা ও সুর-যোজনায় পেয়েছিলেন অসীম সহায়তা। জ্যোতিদাদা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরম সুহৃদ। বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন জ্যোতিদাদা। তিনি নিজে যেমন উৎসাহী, তেমনি অন্যকে উৎসাহ দিতে তিনি আনন্দ পেতেন। রবীন্দ্রনাথ অবাধে তাঁর সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন এবং তিনি বালক বলে তাঁকে কখনও অবজ্ঞা করতেন না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেও একজন উচ্চকোটির সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং কিশোর কবির মধ্যে সাঙ্গীতিক প্রতিভার যে বীজ সুপ্ত রয়েছে তা যে অদূর ভবিষ্যতে মহীরূপের আকার ধারণ করবে সে বিষয়ে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন এ জন্যেই সর্বতোভাবে সংগীতের সকল ক্ষেত্রে তিনি তাঁর

দিশারী তথা গুরুর কাজ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও অগ্রজের এই স্নেহের প্রশ্রয় ও সঙ্গীত সৃষ্টিতে নিরন্তর উৎসাহি দানের কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে উত্তর জীবনে বার বার উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন —

> ''জ্যোতিদাদা, যাকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার' পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তা হলে ভেঙেচুরে তেড়ে বেঁকে যা - হয় একটা কিছু হুতুম, সেটা হয়ত ভদ্র সমাজের সন্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।''[১৫]

ঠাকুরের অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'নতুন দাদা'র কথা রবীন্দ্রনাথ অকপটে স্বীকারও করেছেন। অকৃপণ প্রশ্রয় তিনি পেয়েছেন তাঁর এই সর্ববিদ্যাপারংগম নতুনদাদার কাছে। চিত্রে, সংগীতে, নাট্য—অভিনয়ে, সাহিত্য, ভাষা শিক্ষায়, স্বদেশিকতায় এই অসাধারণ মানুষটি ঠাকুরবাড়িকে আলো করে রেখেছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাঙ্গীতিক প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফুরণকে কোনো বাধা না দিয়ে স্বাধীনভাবে তাকে পরিণতির পথে এগিয়ে দিতে সাহায্য করেছেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহ, যদুভট্ট প্রমুখ অন্যান্য সঙ্গীত গুরুরা শিষ্যের এই মানসিকতা অনুধাবন করতে পারেন নি, এই তাঁদের কাছে নিয়মিতভাবে সংগীত শিক্ষার কোনও প্রেরণা কবি কখনো অনুভব করেন নি। কিন্তু জ্যোতিদাদার স্নেহময় সাহচর্যে তিনি যেন উজ্জীবিত হতেন। কবির স্বীকৃতি —

> ''সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম; তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।''[১৬]

এই জ্যোতিদাদাই প্রাণ উজাড় করে তাঁকে তাঁর আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর নতুনদাদার প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে তিনি নিজের ভাষায় বলেছেন—

> ''তিনি আমাকে খুব-একটা বড়োরকমের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর-কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না; সেজন্য হয়তো কেহ কেহ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে। কিন্তু, পখর গ্রীষ্মের পর বর্ষার যেমন প্রয়োজন আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমন অত্যাবশ্যক ছিল। সে — সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত।''[১৭]

এই কথা আমরা আগেই জেনে এসেছি যে রবীন্দ্রনাথ কোনো ওস্তাদের কাছে দীর্ঘকাল সঙ্গীত শিক্ষা নেন নি, তাই প্রকৃত অর্থে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছেই হয়েছিল। প্রাচীনকালে স্থান ছিল। পরবর্তীকালে এই ধ্রুপদ অঙ্গ গান রচনায় ঠাকুর পরিবারের সঙ্গীত রচয়িতাদের নাম স্মরণীয়। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধ্রুপদ গান রচনার ক্ষেত্রেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করেন। বহু গান আছে যা আলোচনা করলে দেখা যায় উভয় রচয়িতার সুরের সঙ্গে যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। যেমন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত ''গাও রে পরব্রহ্মের মহিমা'' গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচিত ''ডাকো রে মুখ চন্দ্রমা'' গানটি তুলনীয়।

আবার কোন কোন গানে দেখা যায় সুরের সামঞ্জস্য না থাকলেও সুরের মেজাজের সামঞ্জস্য অনুভব করা যায়, যেমন — জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত ''হে অন্তরযামী, ত্রাহি''— এই গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রচিত ''এ পরবাসে রবে কে হায়''। সুতরাং এই আলোচনার দ্বারা বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর জ্যোতিদাদার প্রভাব কতটা বেশী।

অগ্রজের সহায়তায় এভাবেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার গান বাঁধবার শিক্ষানবিশী শুরু হয়। কবি

হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে অধিকার অনন্য সাধারণ। এমনটি বড় একটা দেখা যায় না। তিনি মোট দুই হাজারের ওপর গান রচনা করেছেন। প্রত্যেকটি সঙ্গীতের স্বরলিপি তিনি নিজে তৈরী করে দিয়ে গেছেন। এর দ্বিতীয় উদাহরণ ভূ-ভারতে আছে বলে জানা যায় না। এটি সম্ভব হয়েছিল সঙ্গীতে তাঁর অসামান্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই। স্বভাবতই — তাঁর যেমন কবিতায় ব্যুপত্তি ছিল, তেমনটা গানেও ছিল। অতি শৈশব হতেই তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। পারিবারিক পরিবেশেই স্বভাবত — পাওয়া গুণটিকে পরিস্ফূট করতে সাহায্য করেছিল যথেষ্ট। বিশিষ্ট সুরকারকে সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত করা এই পরিবারের একটি রীতি ছিল। এই সূত্রে যদু ভট্ট তাঁদের অন্যতম। বাড়িতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তেরও অভাব ছিল না। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন দক্ষ সুরকার। এ বিষয় তাঁর বন্ধু অক্ষয় চৌধুরী ছিলেন তাঁর সহায়ক। যেমন সাহিত্য, তেমনি সুরসাধনায়ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুজ রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। গান বাঁধার যে সুবিস্তৃত অধ্যায় তার সূচনা ঘটে এভাবেই।

।। চার ।।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন পিয়ানোতে নুতন নুতন সুর তুলতেন তখন বন্ধু অক্ষয় চৌধুরী ও অনুজ রবীন্দ্রনাথের উপর ভার দিতেন সেই সুরগুলিকে বেঁধে রাখবার এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

> ‘‘এই সময় আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর রচনা করিলাম অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন।’’[১৮]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যেও। তিনি বলেছেন —

> ‘‘এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে

থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপ আমার আরম্ভা হইয়াছিল।"[১৯]

এই ভাবেই একে একে রচিত হয়েছিল ''আমি চিনিগো চিনি তোমারে", পুরানো সেই দিনের কথা", ''ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে" ইত্যাদি ইত্যাদি গানে। এইভাবেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহযোগিতায় এবং তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতাদির ঢঙে রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে সুর সংযোজনা করে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুসরণে রবীন্দ্রসৃষ্ট 'কালমৃগায়', 'বাল্মীকি প্রতিভা' ইত্যাদি গীতিনাট্যের গানে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ সাহায্য করেন। রবীন্দ্রসংগীতের বৃহৎ সম্ভাবে জ্যোতিদাদার প্রেরণা ও উৎসাহ ফধস্রোতের ন্যায় সিঞ্চিত হয়ে যে অভিনবত্ব প্রদান করেছে, তা-অস্বীকার করার উপায় নেই।

সুযোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান এবং যথাস্থানে প্রেরণা ও উৎসাহ দেওয়াই ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপূর্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর তাঁরই সুশীতল ছায়াতলে থেকে অনিন্দ্যসুন্দর কালজয়ী সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সুর মন্দ্রিত অর্নিবচনীয়লোকে অনুপ্রবেশের হাতেখড়ি। এই জ্যেতিদাদার প্রেরণাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে শিশু রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ব্রহ্ম সমাজের জন্য গান সৃষ্টি করেন।

এই ব্রাহ্ম সমাজের কথা বলতে হলে রাজা রামমোহন রায়ের হিন্দু ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'ব্রাহ্মসভা'র নামও বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই 'ব্রাহ্মসভায়', তৎকালীন অন্যান্য গুণীদের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও নিয়মিত যেতেন, কারণ মহর্ষিও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এই সভায় সঙ্গীতের সাহায্যে উপাসনা করার রীতি প্রবর্তন করেন রামমোহন রায় এবং তখনই ব্রহ্মসঙ্গীতে সৃষ্টির সূচনা হয় তাঁর রচিত গানগুলি ছিল অনেকাংশেই ক্লাসিক রীতির অনুকরণ। তবুও এ কথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর গানগুলি সে যুগের বাংলা ভাষার এক নবতর সৃষ্টি।

হিন্দী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুকরণে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বোধকরি তিনিই প্রথম ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাকে যথাযথ অক্ষুন্ন রেখেও বাংলা ভাষার মাধ্যমে সঙ্গীত-রচনা করে সঙ্গীতের এক সহজ সরল রূপকে প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তৎকালীন সভাগায়করা তাঁর রচিত গানে নতুন প্রেরণা লাভ করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গায়ক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ না করলেও, বাংলা ও সংস্কৃতে রচিত তাঁর একাধিক গান পাওয়া যায়। তিনি নিজে যেমন ধ্রুপদী বাংলা গান রচনা করতেন, পুত্রদেরও ঠিক তেমনটা এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। মহর্ষি আর তাঁর পুত্রগণে রা একত্রে বেশ কিছু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, কিন্তু গানের সংখ্যা এবং রচনার উৎকর্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সকলকেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

শুধু গায়ক হিসেবে নয়, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনাতেও পিতার সাধুবাদ পেয়েছিলেন। গায়ক হিসেবে মহর্ষিদেবের কাছে তাঁর কণিষ্ঠপুত্র যে কতটা আদৃত ছিলেন, তা সৌদামিনী দেবীর 'পিতৃস্মৃতি' পড়লে আমরা জানতে পারি, 'বিশেষরূপে ভাল না হইলে তিনি শুনিতে ভালবাসিতেন। শুনিতে ভালবাসিতেন না, প্রতিভার পিয়ানো বাজানো এবং রবির গান শুনিতে তিনি ভালবাসিতেন। বলিতেন, রবি আমাদের বাংলাদেশের বুলবুল'।

কনিষ্ঠ পুত্রের কণ্ঠমাধুর্য পিতৃদেবকে বিমুগ্ধ করলেও সংগীত-রচয়িতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির স্বীকৃতি পেয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। আঠাশ বছর বয়সে, ১২৯৬ বঙ্গাব্দে মাঘোৎসব উপলক্ষে সকাল ও বিকেলে রবীন্দ্রনাথ যখন অনেকগুলো গান লিখলেন তখন, সেই গানগুলির মধ্যে অন্যতম 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে' শুনে দেবেন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে পড়েন।

মহর্ষি তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। তাঁর আহ্বানে জ্যোতিদাদাকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সেখানে যেতে হলে তাঁকে একে-একে সব ক'টি নতুন গান গাইতে হল। কোনো কোনো গান দু'বারও গাইতে হল। হারমোনিয়ম বাজালেন জ্যোতিদাদা। ঘরোয়া আসরে এই গানগুলি শুনে পিতৃদেবের উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনাতেই —

> ''গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিন বলিলেন, দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা

নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।"[২০]

শুধু তাই নয়, এগারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন পিতার সঙ্গে অমৃতসরে ছিলেন কিছুদিন তখন প্রায়ই সন্ধ্যা বেলা মহর্ষি বাগানের সামনে বসতেন আর তখনই তাঁর ডাক পড়ত গান শোনাবার। কবি নিজে তাঁর স্মৃতিচারণ করে বলেছেন —

> ''অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। ... প্রতিদিন সকালবেলায় পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। ... যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম সঙ্গীত শোনাবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি —
>
> তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে, কে সহায় ভব-অন্ধকারে। তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন — সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।"[২১]

রবীন্দ্রনাথ যখন পিতৃদেবের কাছে পুরস্কৃত হয়েছেন, গীতিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তি তার অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছিল। সেইসব গানের প্রসঙ্গে আসার আগে কবিকণ্ঠের মাধুর্য সম্বলিত সুরারোপ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য নিবেদন করি। ১২৯২ বঙ্গাব্দে ১১ মাঘ প্রাতঃকালীন উপাসনায় যে ১১টি গান গাওয়া হয়, সেগুলির মধ্যে ৯টি গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ উপাসনা-সভায় তিনি স্ব-কণ্ঠে পরিবেশনও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত কণ্ঠ শুনে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মন্তব্য, 'খ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমস্ত সঙ্গীতের মধ্যে কয়েকটি গীত স্বয়ং গাহিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর সঙ্গীত সুধায় মুগ্ধ হন নাই প্রাতঃকালীন উপাসনায় এরূপ লোক বিরল।'

শুধু ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান বা মাঘোৎসব-ই নয়, ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার জোয়ারে তিনি যতই ভেসে গেছেন, যতই তাঁকে নানা বিধি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে ভাষণ

দেবার জন্য যেতে হয়েছে, ততই তাঁকে শ্রোতৃবৃন্দের আন্তরিক অনুরোধে ভাষণ দেবার পর এক বা একাধিক গান শোনাতে হয়েছে। বিরক্ত হলেও তিনি বিরক্তি প্রকাশ করতে জানতেন না, ক্লান্ত হলেও তাঁর দেশবাসী কখনও তাঁকে অবসর নিতে দেয় নি। বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্ত পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত তাঁর দেশবাসীর আবেদন নিবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁকে বারবার গাইতে হয়েছে এবং এর প্রধানতম কারণ তাঁর স্ব-রচিত ও স্ব-সুরারোপিত সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অসামান্য প্রীতি ও অসীম অনুরাগ।

বালক রবির চরিত্র গঠনের হাতে খড়ি হয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে। বিশেষত পিতার সঙ্গে কাটান হিমালয়ের দিনগুলি। ঋষিতুল্য পিতার ঈশ্বরভক্তি, ধার সংযত আচরণ এবং অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও, পুত্রের প্রতি স্নেহশীল ব্যবহার তাঁকে যেমন একদিকে পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবনত করত, অন্যদিকে তাঁর জন্য প্রীতিও সঞ্চারিত হয়ে পিতা ও পুত্রের সম্পর্ককে মধুময় করে তুলত। পিতার অলক্ষ্য প্রভাব পুত্রের চরিত্রে বিলক্ষণ বর্তিয়েছিল বলেই হয়তো 'রবি' তাঁর উত্তরকালে 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি'র রচয়িতা হতে পেরেছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি হিসাবে তা ক্ষুদ্র হলেও একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য, যা অনেক রবীন্দ্র গবেষকই স্বীকার করেছেন।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'চরিত্রপূজা' গ্রন্থের প্রবন্ধে পিতার উদ্দেশে এই উক্তি করে বলেছিলেন —

> ''তিনি কোনো দিন তাঁহার সন্তানদিগকে বিলাসভোগ বা ধনাভিমান চর্চার প্রশ্রয় দেন নাই। ধর্ম পরায়ণ গৃহস্থ যেমন সমস্ত অতিথিবর্গের আহার শেষে নিজে ভোজন করেন, তিনি সেইরূপ তাঁহার ভাণ্ডার দ্বারের সমস্ত অতিথিবর্গের পরিবেশে শেষ করিয়া নিজের পরিবারকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি আমাদিগকে ধনসম্পদের মধ্যে রাখিয়াও আড়ম্বরও ভোগোন্মত্ততার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।''[২২]

সত্যিই মহর্ষি ঠিক সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন। বিলাসিতার আবিলতায় পুত্রেরা যাতে আবদ্ধ না হন, একদিকে যেমন তার ব্যবস্থা হয়েছিল, অপর দিকে তেমন ভাবলোকের আকাশে বিচরণে পুত্রদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। সাহিত্য চর্চা, সঙ্গীতচর্চা, অভিনয়, স্বদেশী মেলা — এসব কাজে

পুত্রেরা পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ পেয়েছিলেন। মাসিক পত্রিকা প্রকাশ এবং স্বরচিত গ্রন্থ প্রকাশে পুত্রদের বিরাট স্বাধীনতা ছিল। তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও সহজে মিলে যেত। ফলে তাঁদের মধ্যে বীজাকারে যে সদগুণগুলি সুপ্ত ছিল তারা উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে বিকাশলাভের সুযোগ পেয়েছিল। এ বিষয়েও তাঁর কণিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতিমূলক উক্তি আমরা পাই। তিনি বলেছেন —

> ''তিনি আমাদিগকে যে কী পরিমাণ স্বাধীনতা দিয়াছেন তাহা আমরা ছাড়া আর কে জানিবে? যে ধর্মকে ব্যাকুল সন্ধানের দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্মকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছেন, সেই ধর্মকে তিনি আপনার গৃহের মধ্যে শাসনের বস্তু করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই, কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের কর্মকে বদ্ধ করেন নাই।''[২৩]

এই বৃহৎ পরিবারে এতগুলি ভাইবোন যে একত্র থাকতেন, তা সত্ত্বেও পরিবেশটি ছিল একান্ত মধুর ও শান্তিময়। এটি সম্ভব করেছিল ভাইবোনেদের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ। সবার গুণের সূত্রেই ঠাকুরবাড়িটি যেন 'দেব নিকেতন' এ রূপান্তরিত হয়েছিল। তবে যে পরিবেশে মহর্ষির সন্তানদের মধ্যে নানা গুণের বিকাশের সহায়তা করেছিল, তা প্রধানত তাঁদের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। নিজের আদর্শ চরিত্র পরোক্ষভাবে কাজ করেছিল। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে সুকুমার বৃত্তি সুপ্ত থাকে, তাকে জাগিয়ে তোলার জন্যেই মহর্ষি তার সন্তানদের পরিচর্যা করেছেন, চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আদিকাল থেকে বাংলা সঙ্গীতের যে একটা স্বকীয় রূপ ছিল আজও তা অক্ষুন্ন আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-পরিবার সঙ্গীতের যে বীজ বপন করেছিলেন — পরবর্তীকালে সেই সঙ্গীতের কাঠামো বজায় রেখে বাংলা ভাষার মাধ্যমে তার সার্থকরূপ দিয়েছেন তাঁরই পুত্র-কন্যাগণ। পিন্স দ্বারকানাথের অঙ্কুরিত সঙ্গীতের বীজ উত্তরকালে বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করে যুগ প্রবর্তন করেছে। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ পেলাম সঙ্গীত সাধক রবীন্দ্রনাথকে, যিনি জীবনব্যাপী সাধনায় মহর্ষির উপলব্ধিকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

তথ্যসূত্র –

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছেলেবেলা*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৪৫, পৃ: ৩৭।

২. তদেব, পৃ: ৩৭।

৩. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১ম খণ্ড), *রবীন্দ্রজীবনী*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২০, পৃ: ২৭।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২১, পৃ: ৩৭।

৫. তদেব, পৃ: ৩৭-৩৮

৬. তদেব, পৃ: ৩৯

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *ছেলেবেলা*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৪৫, পৃ: ৩৭।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯২১, পৃ: ৩৯।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *ছেলেবেলা*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৪৫, পৃ: ৩৯।

১০. তদেব, পৃ: ৩৯

১১. তদেব, পৃ: ৩৯

১২. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১ম খণ্ড), *রবীন্দ্রজীবনী*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪২০, পৃ: ২৭।

১৩. তদেব, পৃ: ২৬।

১৪. তদেব, পৃ: ২৬।

১৫. তদেব, পৃ: ৬৭।

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯২১, পৃ: ৭৯।

১৭. তদেব, পৃ: ৭৯।

১৮. অমিতাভ চৌধুরী, *জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার*, সপ্তর্ষি, কলকাতা, ২০১২, পৃ: ১৩৬।

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯২১, পৃ: ৮০।

২০. তদেব, পৃ: ৫৮-৫৯।

২১. তদেব, পৃ: ৫৮।

২২. অমিতাভ চৌধুরী, *জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার*, সপ্তর্ষি, কলকাতা, ২০১২, পৃ: ৯৪।

২৩. তদেব, পৃ: ৯৪।